বাংলা ছোটগল্প
বিচিত্র ভাবনা

সন্দীপ বর
রাকেশ জানা

বাংলা ছোটগল্প
বিচিত্র ভাবনা

সন্দীপ বর ॥ রাকেশ জানা

একুশশতক
১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

নগ্ন নারী : শক্তির আধার, প্রসঙ্গ 'দ্রৌপদী'

ড. রাকেশ জানা

১৯২৬ সালের ব্রিটিশ ভারতের ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬)। মহাশ্বেতার মা ধরিত্রী দেবী লেখক ও সমাজকর্মী। বাবা মণীশ ঘটক কর্মসূত্রে যখন রংপুরে থাকতেন তখন কিশোরী মহাশ্বেতা একটি সাইকেল নিয়ে গোটা শহর চষে বেড়াতেন। লোকজনের কাছে গিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাদের গল্প শুনতেন। মেটারলিঙ্কের বিখ্যাত নাটক 'ব্লু বার্ড' এর শিশু চরিত্র তিলতিল থেকেই তাঁর ডাক নাম তুতুল হয়েছে। ছেলেবেলা মণীশ ঘটক মহাশ্বেতা দেবীকে তুতুল নামে ডাকলে তিনিও বাবাকে ঐ একই নামে ডাকতেন। বাল্যকালে মেদিনীপুর মিশন স্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি হন। এরপর ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৮ সাল সপ্তম শ্রেণি অবধি শান্তিনিকেতনে পড়েছেন। অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হন বেলতলা বালিকা বিদ্যালয়ে, এখান থেকেই ১৯৪২ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন। এরপর আশুতোষ কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। ১৯৪৬ সালে মহাশ্বেতা শান্তিনিকেতনে স্নাতক হন। ১৯৪৭ সালে বিবাহ করেন নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যকে। তাঁদের দাম্পত্য জীবন বেশি বছর দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তবে বিজন ভট্টাচার্য সম্পর্কে তাঁর অভিমত—'Bijan has shaped my talent and given it a permanent form. He has made me into what I am today'। আসলে তাঁর ও বিজন ভট্টাচার্যের জীবনের প্রথমটা ছিল খুব সংগ্রামের, পুরনো কমিউনিস্টদের মতো দুঃখ-কষ্ট করে যৎসামান্যে চলার অভ্যেস তাঁকে জীবনে আরো শক্ত করে। বিবাহিত জীবনের পনেরো বছর পর ১৯৬২ সালে বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ হয়। এরপর ১৯৬৫ সালে বিবাহ করেন অসিত গুপ্তকে। ১৯৭৬ সালে আবার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। এরই মাঝখানে প্রায় সতের বছর পর প্রাইভেটে পরীক্ষা দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি ভাষায় স্নাতকোত্তর পাশ করেন। তাঁর পেশাগত জীবন শুরু হয় ১৯৪৮-৪৯ খ্রিস্টাব্দে পদ্মপুকুর ইন্সটিটিউশনে শিক্ষকতার কাজ দিয়ে। এরপর তিনি কেন্দ্রীয় ডেপুটি অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের কাজে যোগদান করেন। এই পেশাতেও তিনি বেশিদিন কাজ করেননি। এরপর তিনি পোস্ট ও টেলিগ্রাফ অফিসের আপার ডিভিশনের ক্লার্কের কাজে বহাল হন।

মাত্র দুই বছর পর তাঁকে কমিউনিস্টদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার অভিযোগে বরখাস্ত করা হয়। যদিও 'কাব্য জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের লেখক অতুলচন্দ্র গুপ্তের অনুরোধে পুনরায় কাজে বহাল করা হয়। যদিও এটি স্থায়ী চাকরি ছিল না বলে পুনরায় ছাঁটাই হতে হয়। এই সময় আর্থিক দুরবস্থা কাটাতে তিনি কাপড় কাচা সাবান বিক্রি করেছেন, টিউশনি পড়িয়েছেন। ১৯৫৭ সালে তিনি রমেশ মিত্র বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ পান। এরপর ১৯৬৪ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভের পর ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে বিজয়গড় কলেজে যোগদান করেন। কলেজ মাইনে কয়েক মাস অন্তর বকেয়া পড়ে থাকলে তিনি দিল্লি বোর্ডের অধীনে স্কুলপাঠ্য বই লিখে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করেছেন। তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সালের ২০ অক্টোবর 'সচিত্র ভারত' পত্রিকায়, গল্পের নাম 'মরা চিঠি'। তিনি ভারতের বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, ছত্রিশগড় রাজ্যের আদিবাসী উপজাতি (বিশেষত লোধা ও শবর উপজাতি) অধিকার ও ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করেছিলেন। মুন্ডা, খেড়িয়া, শবর, লোধা, দুসাদ, গঞ্জু, ভাঙ্গি, চুয়াড় প্রভৃতি অন্তেবাসী আদিবাসী জনজীবন তাঁর সাহিত্যে অমর হয়ে আছে। তিনি নিজেই বলেছেন—"একটা না দেখা ওয়ার্ল্ড কেউ জানে না বোঝে না। তার সমস্ত অনুভূতিগুলি ক্ষোভ-দুঃখগুলি আমার লেখার কালির সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল।" মহাশ্বেতা দেবী 'সুমিত্রা দেবী' ছদ্মনামে খগেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত 'রংমশাল' পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে ঐ একই ছদ্মনামে ১৯৪৮-৪৯ খ্রিস্টাব্দে 'সচিত্র ভারত' পত্রিকায় লিখতে থাকেন। ১৯৬৫ সাল থেকেই তিনি বিহারের পালামৌ যেতে শুরু করেন। পালামৌকে সেই সময়ে ভারতের অন্যতম দরিদ্রতম জেলা বলে মনে করা হত। এই জেলাগুলিতে তখনও ব্রিটিশদের আনা বণ্ডেড লেবার বা ভূমিদাস প্রথা বেঁচে ছিল। এতে আদিবাসী সহ অন্যান্য নিচু সম্প্রদায়ের যে কোন অজুহাতে জমি ছিনিয়ে নেওয়া হতো এবং এদের ঋণদাস মজদুরে পরিণত করা হত। ১৯৭৬ সালে ভারত সরকার বন্ডেড লেবার প্রথা নিষিদ্ধ করেন। মহাশ্বেতার কাজ হল এই অবহেলিত, বঞ্চিত, পিছিয়ে পড়া মানুষদের নিয়ে যাদের তিনি 'the voice-less section of Indian society' বলে বলেছেন তাদের অধিকারের জন্য লড়াই। মহাশ্বেতা হলেন—'শ্রেণিবিভক্ত বর্ণবিচ্ছুরিত যৌনতাশাসিত ধর্মসাপেক্ষ প্রাদেশিকতা-নির্ভর' এক ভারতের লেখক।

তিনি দেখেছিলেন যতদিন বন-জঙ্গল ছিল ততদিন শিকারী আদিবাসীরা কোন কষ্ট পায়নি। কিন্তু বন কেটে বসত ও চাষযোগ্য জমি বানানোর ফলে জঙ্গলের অধিকার ক্রমশ হারাতে থাকে আদিবাসীরা। শহুরে আদব-কায়দায় ক্রমশ এরা বিপন্ন বোধ করে। এদের মধ্যে অবশ্য চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কারণে

সাঁওতাল, মুন্ডা, দ্রাবিড়, ওরাওঁ কিছুটা এগিয়ে যায়। কিন্তু সারা ভারতে ছোট ছোট আদিবাসী ব্যাধ গোষ্ঠীগুলি লোধা এবং খেড়িয়ার মতই বিপন্ন। ভারত সরকার ওদের নিঃস্ব করে ছেড়েছে, ওরা টাকা-পয়সা চায় না, চায় শুধু একটু সুযোগ সুবিধা; সম্মান বজায় রেখে সাধারণ দরিদ্রের মতো বেঁচে থাকতে। অন্তেবাসী লোকজনের লোকবিশ্বাসের ভয়ঙ্কর পিছুটান মহাশ্বেতাকে চিন্তিত করেছিল। তাদের গৌরববোধের মধ্যে আছে দাসত্ব-শৃঙ্খল, বঞ্চনাকে ওরা আশীর্বাদ বলেই মেনে নেয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো তিনি দেখেছিলেন এই অন্তেবাসী সমাজে সংস্কারের শাসনকে অনন্ত করে রাখার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে এক একটি পুরাকথা। পাখমারারা (সাঁঝ সকালের মা) 'জরা ব্যাধের বংশধর', ডোম (বাঁয়েন) জাতির লোকেরা আদিম গঙ্গাপুত্রের সন্ততি যে হরিশচন্দ্রের কাছে পৃথিবীর সকল শ্মশান ভিক্ষা পেয়ে নির্বোধ আনন্দে দুই হাত তুলে ভীষণ নেচেছিল, বলেছিল এ পৃথিবীর সকল শ্মশান মোদের। মহাশ্বেতা এই অন্তেবাসীদের পুরাকথা-অতিকথাকে রমণীয় করে দেখানোর সাথে সাথেই নিম্নবর্গীয় মানুষের শোষণের ইতিহাসকেও তুলে ধরেন। মহাশ্বেতার অনেক গল্প-উপন্যাসে নকশাল আন্দোলনের প্রভাব রয়েছে। আমাদের আলোচ্য 'দ্রৌপদী' গল্প নকশাল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল।

নকশাল আন্দোলন একটি কমিউনিস্ট আন্দোলন যা বিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে পশ্চিমবঙ্গের নকশালবাড়ি থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে ভারতের ছত্রিশগড় (তদানীন্তন মধ্যপ্রদেশ) এবং অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। নকশাল অর্থে উগ্র বামপন্থী দলগুলিকে নির্দেশ করা হয়। চিন-সোভিয়েত ভাঙনের সময় এই দলের জন্ম হয়। ষাটের দশকের মাঝামাঝি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি কোনদিনই বিপ্লবের পথে এগোবে না এটা ভেবে পার্টির অভ্যন্তরে বিভিন্ন মতাদর্শের সৃষ্টি হয়। ১৯৬৬ সালে খাদ্য আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে অনেকে প্রাণ হারান। এই সময় আন্দোলনকে চাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যে শাসকবর্গ ১০০ গ্রাম গম ও ৫০ গ্রাম চাল দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এতে ক্ষতিপূরণ হয় না মনে করে, বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। তাই নকশালবাড়ির কৃষক বিদ্রোহ ঐ বিরুদ্ধ চিন্তারই ধারাবাহিক ফলশ্রুতি। তাই ১৯৬৭ সালে কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পৃথক উগ্র বামপন্থীদল (মার্কবাদী-লেলিনবাদী) গঠন করে। এই বিপ্লবীদলের নেতৃত্বে ছিলেন চারু মজুমদার, সুশীতল রায়চৌধুরী, কানু সান্যাল ও জঙ্গল সাঁওতালরা। এই বিদ্রোহের সূচনা হয় ১৯৬৭ সালের ২৫ মে। নকশালবাড়ি গ্রামে কৃষকদের উপর ভূস্বামীদের অত্যাচার চরমরূপ লাভ করলে কৃষকেরা সম্মিলিত প্রতিবাদ করে ভূস্বামীদের উৎখাত করে। চারু মজুমদার কৃষক আন্দোলনকে

সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে লেখনী ধারন করেন। তাঁর বিখ্যাত রচনা 'হিস্টোরিক এইট ডকুমেন্টস' বা আট দলিল নকশাল মতাদর্শের ভিত্তি রচনা করে। নকশাল আন্দোলন কলকাতার ছাত্র সংগঠনগুলোর ব্যাপক সমর্থন লাভ করেছিল। মেধাবী ছাত্রদের একটা বড় অংশ লেখাপড়া ছেড়ে এই বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়েছিল। চারু মজুমদার নকশালদের শ্রেণিশত্রুকে খতম করার নির্দেশ দেন। এই শ্রেণিশত্রুদের মধ্যে যেমন ছিল ভূস্বামী, মহাজন, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, পুলিশ অফিসার, রাজনীতিবিদ এবং আরো অনেকে। ফলে নকশালপন্থী ছাত্র-ছাত্রীরা সন্ত্রাসের পথে হাঁটে।

সরকার নকশালদের শক্ত হাতে দমনের সিদ্ধান্ত নেয়। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় নকশালদের উপর প্রতি আক্রমণের নির্দেশ দেন। পুলিশ নকশালদের দমনে নির্বিচারে হত্যা অকারণে কাউকে বন্দী করার বিশেষ অধিকার পায়। নির্বিচারে লকআপে হত্যা তথা জেলবন্দীদের হত্যা, ভুয়ো সংঘর্ষ দ্বারা পুলিশও সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে চরমপন্থী নকশালদের দমন করে। নকশালদের মধ্যে অন্তর-কলহের কারণে আন্দোলনে ছেদ পড়ে। আসলে তখন সিপিআই (এম এল)-এর পার্টি তখন বিভক্ত দশা। দলের মধ্যেই গড়ে উঠেছিল অনেক উপদল। সহযোদ্ধা কমরেডদের মধ্যে সন্দেহ ও বিদ্বেষের বিষ ঢুকে পড়েছিল। তারা একে অপরকে 'অতি বিপ্লবী', 'বিলোপবাদী','সাম্রাজ্যবাদের দালাল' অভিধায় ভূষিত করতো। অনেক অ্যাকশনিস্টরা তখন শত্রুশিবিরে যোগদান করে 'কাংশাল' হয়ে বিপ্লবীদের ধরিয়ে দিয়েছে। এই পারস্পরিক বৈরী-ভাবনার সুযোগে শাসকদল ফাটল ধরিয়েছে নকশাল মানসিকতায়। এই কারণে চারু মজুমদার ধরা পড়েন এবং আলিপুর জেলে পুলিশের হাতে নিহত হন। তাত্ত্বিক নেতা সরোজ দত্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলেও পরে তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়নি। সুশীতল রায়চৌধুরীও আত্ম-গোপন থাকা অবস্থায় মারা যান। প্রধান নেতৃবর্গের অনেকেই তখন হাজতে যান।

মহাশ্বেতা দেবীর হাজার চুরাশির মা উপন্যাসে নকশালদের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। সাহিত্যিক কিন্নর রায় বলেছেন—'টাটকা তরুণ, তাজা ব্রতীরা তখন লাশকাটা ঘরে ঢুকে যাচ্ছে লাশ হয়ে। রাষ্ট্র হত্যা করেছে তাদের। তারাও এই পচাগলা ব্যবস্থা, 'নিপীড়ণের যন্ত্র' এই রাষ্ট্র ব্যবস্থাকেই ভেঙে দেবে, এই স্বপ্ন নিয়ে পথে নেমেছিল। ঘরবাড়ি, মা-বাবা, পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, প্রেমিকা, স্ত্রী, আরাম সুখের নিশ্চিন্ত জীবন, পড়াশোনা, কেরিয়ার চাকরি-বাকরি, পড়ানো, অধ্যাপনা—সব ছেড়ে আগুনের নদীতে ভাসাতে চেয়ে অগ্নিময় ডালপালা বেয়ে শূন্যে উঠে ভোরের সূর্যকে আকাশ থেকে পেড়ে আনার স্বপ্ন নিয়ে তারা ধুলোয়

নেমেছে। বেছে নিতে চেয়েছে পেশাদার বিপ্লবী- প্রফেশনাল রেভেলিউশনারীর কন্টকময়, কষ্টের জীবন। ভূমিহীন কৃষক, ক্ষেতমজুরদের বাড়ি, শ্রমিক মহল্লায়, কুলি ধাওড়া, বস্তিতে-বস্তিতে তারা বুনে দিতে চেয়েছে আগ্নিবীজ। সমাজ বদলের স্বপ্ন, সুস্থ, সুখী, শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ ভারতের স্বপ্ন। ফলে ব্রতীরা তাদের স্বভাবধর্মে নিহত হয়েছে। ঢুকে গেছে মর্গের নিঃস্তব্ধ শূন্যতায়, লাশ হয়ে। তারা মরতে চেয়েছিল, চেয়েছিল মারতেও। হনন-আত্মহননের চোরা গলিতে ঘুরপাক খেয়েছে সেই আন্দোলন, তাকে নিয়েই তো হাজার চুরাশির মা।'[১] ১৯৭২ সালে 'প্রসাদ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'হাজার চুরাশির মা' গোপনে জেলখানায় বিপ্লবীদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। নকশাল আন্দোলনকে প্রেক্ষাপট করে 'অমৃত' পত্রিকায় বের হয় 'দ্রৌপদী' গল্প। যেটি ১৯৮০ সালে 'অগ্নিগর্ভ' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। খবরের কাগজে এক মহিলা ডোমের খবর পড়ে লিখেছিলেন 'দ্রৌপদী' গল্প। আবার ভিখারি দুসাদরা বঞ্চিত থাকে জল-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত ক্রমশঃ বহুজাতিকের হাতে পড়ে আরো বেশি হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে আদিবাসীদের। এতে দোসর হয়েছে দেশীয় পুঁজির মদত, বক্সাইটের সন্ধানে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে আস্ত এক-একটা পাহাড়, বিক্রি হয়ে যাবে নদী, জঙ্গল,—সমস্তই দেশী বিদেশী পুঁজিপতিদের দখলে চলে যাবে। মহাশ্বেতা দেবীর লেখায় এই অন্যায়ের প্রতিবাদ পাওয়া যায়। তাই তাঁর লেখায় 'উলগুলানের মরণ নাই' এই উচ্চারণ শোণা যায়। অর্থাৎ সংগ্রাম কখনও ফুরোয় না। 'আদিবাসী মূলবাসী সাঁওতাল, হো, মুন্ডা, শবর, খেড়িয়া, লোধা, কুরমি-সকলের কথা নতুন করে উঠে আসছিল তাঁর কলমে, সত্তর-আশি-নব্বইয়ের দশকে। চাঁদ-ভৈরব, সিধু-কানু, বিরসা মুন্ডা, শালগিরার ডাক হয়ে আছাড় খাচ্ছিল সাহিত্য পাঠকের সামনে। নতুন নতুন বিদ্রোহের কথা, আদিবাসী উপকথার সেই দুই হাঁস-লিঠা ঠাকুরের হাঁস—পিলচু হড়াম, পিলচু বুড়ি, গাঁওবুড়ি আর গাঁওবুড়িদের কথা, আদিবাসী গাঁওতাঁর বিষয় আমরা জানতে পারছিলাম নতুন ভাবে, নতুন করে। মুন্ডাদের কবর, পাথরে চাপা সেই সব কবরের ইতিহাস ফুটে উঠেছিল নতুন ভাবে।'[২] মহাশ্বেতা দেবী কোন শৌখিনতাকে প্রশ্রয় দেননি, আদিবাসী জীবনের সঙ্গে তাঁর গভীর আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল। তাঁর বালিগঞ্জ স্টেশন রোডের বাড়ির দোতলাতে এই আদিবাসী অ-শহুরে লোকজনের ভিড় সর্বদাই থাকতো। এই আদিবাসী অন্ত্যজদের জন্য তিনি আইনি লড়াইয়ের ব্যবস্থা করে দিতেন, কখনো তাদের দাবি প্রশাসনের কাছে পৌঁছে দিতেন। তিনি ওদের সাথেই কখনো ঘুরেছেন জঙ্গলে, কখনো পাহাড়-পর্বতে। মহাশ্বেতা কোন দিনই সিপিএম (বামফ্রন্ট)-এর রাজনীতির ধারার অনুরক্ত ছিলেন না। সাহিত্যিক কিন্নর রায় বলেছেন—'বামফ্রন্টের শাসনকালে জ্যোতি বসু যখন মুখ্যমন্ত্রী তখন তাকে

গাদা গাদা চিঠি লিখছেন মহাশ্বেতা। বিবিধ সমস্যা, আদিবাসীর সমস্যা, সাঁওতাল, শবর, খেরিয়া, ডোম, লোধাদের সমস্যা। লোধাদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যেভাবে ক্রিমিনাল ট্রাইব বলে ঘোষণা করে রেখেছিল, তার বিরুদ্ধে মহাশ্বেতার লড়াই স্মরণীয়। স্বামী অগ্নিবেশের সঙ্গে বান্ধুয়া মজদুর বনডেড লেবারদের মুক্তির জন্যে তাঁর লেখালেখি, লড়াই মনে পড়ে। বেঠবেগারী প্রথার বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন তিনি'[৩]। ট্রাইবাল রাইটস অ্যাকশান গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতাদের তিনি একজন। এই সংগঠন শুধু বাংলা নয় গুজরাট, মহারাষ্ট্র জুড়ে আদিবাসীদের অধিকারবোধ নিয়ে কাজ করে। ২০০৪ সালে সেলিব্রেটিং উইমেন, এ সিম্ফজিয়াম অন উইমেন হু মেড অ্যা ডিফারেন্স অধিবেশনে গণেশ এন দেবী মহাশ্বেতা দেবী প্রসঙ্গে বলেছিলেন—'তিনি আদিবাসী সভ্যতার মাধুর্য নিয়ে কথা বলতেন। আমাদের সমাজ কীভাবে উপমহাদেশের মহান সংস্কৃতি ধ্বংস করছে , নিরীহ মানুষেরা কীভাবে বর্বরতার শিকার হয়েছে সে সম্পর্কে বলতেন। ব্রিটিশ শাসকদের করা কুখ্যাত আদিবাসী আইন ১৮৭১, ১৯৫২ সালে ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া, ভারতের বিভিন্ন যাযাবর ও সাপুড়ে সম্প্রদায়ের দুর্দশার কথা তিনি তুলে ধরেছেন'। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি এই নির্যাতিত, নিপীড়িত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অতিবাহিত করেছেন। প্রত্যন্ত গ্রামে ঘুরে ঘুরে এই জনজাতির বেদনাকে উপলব্ধি করেছেন। তাই তো তাদের স্ববিকাশে তিনি হয়ে উঠেছিলেন মারাং দাঈ। তাদের পরিবেশ, জীবনযাত্রার অসহায় যাপনচিত্র তাঁর কলমের রেখায় ফুটে উঠেছে। কখন তাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে শরিক হয়েছেন, কখনো বা পরোক্ষ ভাবে সংগ্রামে তাদের উৎসাহিত করেছেন। এই অরন্য সন্তানদের পাশে নিয়ে তাদের ন্যায্য অধিকারের দাবীতে সমাজ-চেতনায় আঘাত হেনেছেন। বিশেষত নারীদের বঞ্চনা ও বিপন্নতার কথাই ফুটে উঠেছে তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলিতে। পশ্চিম মেদিনীপুরের গোহালদেহী নামে ছোট গ্রামের মেয়ে চুনি কোটালের কথা তাঁর 'ব্যাধখণ্ড' লেখনিতে অমর হয়ে রয়েছে। লোধা সম্প্রদায়ের এই নারী বিপ্রতীপ অবস্থাতেও দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে ১৯৮৫ সালে তাদের সম্প্রদায়ের প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট হয়। মেদিনীপুর রানি শিরোমণি এস সি অ্যান্ড এস টি গার্লস হোস্টেলের সুপারিন্টেনডেন্ট হিসেবে কর্মজীবন শুরু করে চুনি কিন্তু সেখানেও হয়রানির শিকার হয়। এরপর বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ পড়ার সময়ও সে নিপীড়িত হয়। প্রয়োজনীয় পাস গ্রেড দিতে অস্বীকৃতি জানানো হয়। তাকে বলে দেওয়া হয় শিক্ষাগ্রহণের তার কোন অধিকার নেই। সম-সম্প্রদায়ের একজন মানুষকে ভালোবেসে বিবাহ করলেও তারা একসঙ্গে থাকতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত অপমানিত হতাশ চুনি ১৯৯২ সালে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

মহাশ্বেতা দেবী 'অরণ্যের অধিকারে' (১৯৭৭) ভারতের আদিবাসী মুণ্ডারা গহন অরণ্য পরিষ্কার করে খুটকাট্টি গ্রামের পত্তন করে, চাষের জমি প্রস্তুত করে। মোটং-খা এই পাহাড় জঙ্গল জমিকে তারা নিজেদের কাজে লাগায়। জঙ্গল তাদের কা মাতৃসম, এই জঙ্গলকে তারা সন্তানের মতো রক্ষা করতো; কিন্তু তাদের জী নে নেমে আসলো দিকুদের (বহিরাগত) সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থার শোষণ ও র্মান্তরিতকরণের চক্রান্ত। জায়গিরদার ইজারাদারি প্রথায় তাদের উপর শোষণ াসন অত্যাচার বৃদ্ধি পেতে থাকলো। দিকুরা নানা ছুতায় কেড়ে নিত তাদের মি। চলতে থাকে বেঠবেগারী ও ভাতুয়া বানিয়ে দেবার প্রক্রিয়া। 'হা দেখ, দিকু ড়া চায়, মুণ্ডা পয়সা দিবে। দিকু পালকি চায়, মুণ্ডা দাম দিবে, দিকু যা চায় সব দিবে মুণ্ডা। দিকুর ঠিকাদারকে সাহেবের আদালতে জরিমানা করলে টাকা জোগাবে মুণ্ডারা। তা বাদে জোর করে টাকা ধার নিয়া করাবে মুণ্ডাকে। তা বাদে উচ্ছেদ করে দেবে।'[৪] এই অত্যাচার নিপীড়ন লাঞ্ছনা গঞ্জনার বিরুদ্ধে বিরসার নেতৃত্বে তারা প্রতিরোধ গড়ে তোলে; ডাক দেয় উলগুলানের। তাদের দাবি জঙ্গলের আদি অধিকার। শোষক কি শুধু জমিদার, মহাজন ও তার উপসত্ত্বভোগীরা; তা নয় এই অন্ত্যজদের বিপন্নতার শেষ নেই। জমিদার বাদেও শোষক প্রশাসন বা সরকার। 'মুণ্ডারে কি শুধু মালিক মহাজন মারে? আইন মারে, আদালত মারে, পুলুশ মারে। সবাই মারে।'[৫] এভাবেই মূল জীবন থেকে তাদের দূরে সরিয়ে রাখা হয় আর ক্রমাগত তারা মূল স্রোত থেকে পিছিয়ে পড়ে। এই আন্দোলন চোট্টি মুণ্ডা থেকে হরমুর মধ্যে দিয়ে ছড়িয়ে যায় দিক-বিদিকে। 'জন্ম পাঁকে হলে, মানুষ পাঁকে পড়ে থাকবে'—মহাশ্বেতা এই বাচন ভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটান। তাই মুণ্ডারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে দিকুদের বিলাস ও মুনাফার উৎস অরণ্যকে পণ্যে পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করে। মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্রতে অষ্টম খণ্ডের ভূমিকা অংশে মহাশ্বেতা বলেছেন—'মানুষের প্রতি এ ধরনের চূড়ান্ত উন্নাসিকতা সম্ভবত ভারত-বর্ষের মতো আধা ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক, বৈদেশিক শোষণে অভ্যস্ত দেশের পক্ষেই সম্ভব। শহরেই কি মুক্তি আছে? বেকার-সমস্যা ক্রমবর্ধমান, দ্রব্যমূল্য আকাশছোঁয়া, শিক্ষায় চূড়ান্ত নৈরাজ্য, এতে মধ্যবিত্ত ভারসাম্য হারাচ্ছে। প্রবল ধাক্কায় চলে যাচ্ছে অন্য শ্রেণির দিকে। শ্রেণিসংগ্রামের ক্ষেত্র স্পষ্টতর হচ্ছে। ইতিহাসের এই সন্ধিলগ্নে একজন দায়িত্ববান লেখককে কলম ধরতেই হয় শোষিতের সপক্ষে, অন্যথায় ইতিহাস তাকে ক্ষমা করে না। জীবনের অঙ্ক নয় এবং রাজনীতির জন্য মানুষ নয়। আমি অন্ন জল, জমি, ঋণ, বেঠবেগারী কোনটি থেকে মানুষকে মুক্তি পেতে দেখলাম না, যে ব্যবস্থা এই মুক্তি দিল না তাঁর বিরুদ্ধে নিরঞ্জন শুভ্র সূর্য সমান ক্রোধই আমার লেখার প্রেরণা। দক্ষিণে-বামে সকল দলই সাধারণ মানুষকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হয়েছে।'[৬]

তাঁর 'দ্রৌপদী' (১৯৭৬) গল্পের প্রেক্ষাপট ১৯৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গের নকশালবাড়ি আন্দোলন। যদিও ১৯৬৭-তে নকশালবাড়ি থেকে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। দ্রৌপদী ও ঝুলন ছিল এই আন্দোলনের যোদ্ধা। তাদের নামে পুলিশ ওয়ারেন্ট। কারণ তারা এলাকার দাপুটে জমিদার সূর্য সাহুর খুনের মামলার আসামী। এই গল্পে মহাশ্বেতা দেবী শুধুমাত্র গেরিলা যোদ্ধার জীবনযাপন ও রোমহর্ষক বীরত্বের কাহিনী আবদ্ধ না রেখে বিষয়বস্তুকে বৃহত্তর রূপদান করার চেষ্টা করেছেন। মহাশ্বেতা দেবী 'প্রতি চুয়ান্ন মিনিটে' উপন্যাসের ভূমিকা অংশে বলেছেন, ভারতে প্রতি চুয়ান্ন মিনিটে একজন নারী ধর্ষিত হয়, অর্থাৎ দৈনিক প্রায় সাতাশ জন। পণের জন্য বধূহত্যা প্রতি দু'ঘণ্টায় একটি; অর্থাৎ দৈনিক বারো জন। আমরা ভারতীয়রা শুধু ধর্ষণ ও বধূহত্যা করি না, প্রতি তেতাল্লিশ মিনিটে একটি নারীকে অপহরণ করি, প্রতি ছাব্বিশ মিনিটে একটি নারীকে নিগ্রহ করি, প্রতি তেত্রিশ মিনিটে একজনকে নিষ্ঠুর নির্যাতন করি। প্রতি বাহান্ন মিনিটে একটি মেয়েকে ইভটিজিং করি। অর্থাৎ নারী যে নির্যাতিত একথা আমরাও মানি এবং খবরের কাগজে বারবার নারী নির্যাতনের সাক্ষ্যপ্রমাণ আমাদের পিতৃতন্ত্রের আত্মসন্তুষ্টি বজায় রাখে। এই পিতৃতন্ত্রের কাছে প্রকৃতি-স্বরূপা নারীও বড্ড বেশি অসহায়; তাই অকারণে আমরা গাছের পাতা ছিঁড়ি, গাছ কাটি। Socialist Ecofeminism এর মতে, পুঁজিবাদে নারী ও প্রকৃতি; উভয়েই পুরুষ শোষিত এবং পুরুষ শাসিত। চিপকো আন্দোলনের মহিলারা দেখিয়েছিলেন প্রকৃতি হল সকল সম্পদের স্রষ্টা ও উৎস। প্রকৃতির সাথে নারীর সম্পর্ক, আপন প্রকৃতির সাথে সম্বন্ধ ও বাহ্যিক পরিবেশের সাথে অন্বয়ই পরিবেশ রক্ষার মূলে। তাই গ্রামীণ নারী, কৃষক-সম্প্রদায়, অরণ্যজীবী আদিবাসী সম্প্রদায় এই প্রকৃতি মুখাপেক্ষী হয়েই বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহ করে। এতকাল ধরে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ সংগ্রামী, নারী তার সেবিকা মাত্র এভাবে দেখার একটা প্রবণতা রয়েছে। কিন্তু মহাশ্বেতা দেবী এই ধারণাকে নস্যাৎ করে তাঁর কথাসাহিত্যে নারী চরিত্রদের বিদ্রোহিণী করে তুলেছেন—সালী, মানী, ফুলনা, জোনী (অরণ্যের অধিকার) ও দ্রৌপদী। ২০০৪ সালে সেলিব্রেটিং উইমেন : এ সিম্পোজিয়াম অন উইমেন হু মেড অ্যা ডিফারেন্স-এ গণেশ এন দেবী মহাশ্বেতা সম্পর্কে বলেছিলেন—'তিনি আদিবাসী সভ্যতার মাধুর্য নিয়ে কথা বলতেন। আমাদের সমাজ কীভাবে উপ-মহাদেশের মহান সংস্কৃতি ধ্বংস করেছে, নিরীহ মানুষেরা কীভাবে বর্বরতার শিকার হয়েছে সে সম্পর্কে বলতেন। ব্রিটিশ শাসকদের করা কুখ্যাত আদিবাসী আইন ১৮৭১, ১৯৫২ সালে ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া, ভারতের বিভিন্ন যাযাবর ও সাপুড়ে সম্প্রদায়ের দুর্দশার কথা তিনি তুলে ধরেছেন।'[৭] ট্রাইব্যাল রাইট অ্যাকশন নিয়ে তিনি বাংলা, গুজরাট ও মহারাষ্ট্র জুড়ে আদিবাসীদের নিয়ে কাজ করে

গেছেন। মহাশ্বেতার ছোটগল্প গ্রন্থে উঠে এসেছে বাগদি, ডোম, পাখমারা, ওঁরাও, গঞ্জু, মাল, খেরিয়া, লোধা, শবর প্রভৃতি অন্ত্যজ আদিবাসী জনজাতির মানুষের কথা। 'শালগিরার ডাকে' (১৯৮২), 'ইটের পরে ইট' (১৯৮২), 'হরিরাম মাহাতো' (১৯৮২), 'সিধু কানুর ডাকে' (১৯৮৫) প্রভৃতি গল্পগ্রন্থে এই অন্ত্যজ জনসমাজের জীবনচর্যা ও সংগ্রামের উল্লেখ রয়েছে। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে এই জনজাতির বেদনার প্রকৃত ছবিটা উপলব্ধি করেছেন। পূর্বেই বলেছি সরকার পক্ষের কাছে এদের দাবি ও সমস্যার কথা জানিয়ে তিনি বিস্তর চিঠিপত্র লিখেছিলেন। এছাড়াও তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাতেও বিশেষ সংখ্যায় এই জনজাতি বিষয়ে (লোধা সংখ্যা, মুন্ডা সংখ্যা, ওঁরাও সংখ্যা) সমাজকে অবগত করেছিলেন। সমাজের এই সাবলটার্ন বা অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষেরা যাতে নিজেরাই সংগঠিত হয়ে উঠতে পারে তার পথপ্রদর্শক হয়ে তাদের আত্মউন্নয়নে সর্বদাই সচেষ্ট থেকেছেন মহাশ্বেতা। সরকার পক্ষের বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি কতটা কার্যকর হয়েছে, সে বিষয়েও সকলকে সজাগ করেছেন তিনি। তাই শুধু সাহিত্য-সৃজনে নয় তাঁর কর্মক্রিয়াতেও তিনি বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন।

'দ্রৌপদী' গল্পে নারীর নগ্নতাকে শক্তির আধার হিসেবে তুলে ধরেছেন মহাশ্বেতা। গল্পের কেন্দ্রীয় মূল চরিত্র এক নারী দ্রৌপদী। অনার্য সাঁওতাল উপজাতির বিদ্রোহের প্রতিনিধি। শোষক শ্রেণির প্রতিনিধি বাকুলির মহাজন সূর্য সাহু ও তার ছেলেকে খুন করার অপরাধে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট তাকে তন্য তন্য করে খুঁজে বেড়াচ্ছে। বিশেষ করে পুলিশ ক্যাপ্টেন অর্জুন সিং-এর কাছে দ্রৌপদী 'মোস্ট নটোরিয়াস মেয়েছেলে। লং ওয়ান্টেড ইন মেনি..."[৮]। ১৯৭১ সালে এই অর্জুন সিং-এর তত্ত্বাবধানে 'বাকুলি অপারেশন'কে সে ও তার স্বামী ব্যর্থ করে ফেরার হয়। বাকুলি ছেড়ে বেরোনোর পর তাদের ছদ্মনাম হয়-উপী মেঝেন ও মাতং মাঝি। পরবর্তীকালে তার স্বামী দুলন স্বজাতি দুখিরাম ঘড়ারীর বিশ্বাসঘাতকতায় পুলিশের গুলিতে মারা যায়। তবে মারা যাওয়ার আগে দুলন 'মাহো' বলে চিৎকার করে লড়াইয়ের ডাক দিয়ে যায়। দ্রৌপদী একলাই এরপর গেরিলা পদ্ধতিতে সংগ্রাম করতে থাকে। তবে পুলিশের খোঁচড় স্বজাতি একদা সংগ্রামের সহকর্মী সোমাই ও বুধুনার বিশ্বাসঘাতকতায় দ্রৌপদী বেশিদিন আত্মগোপন করে থাকতে পারে না; ধরা পড়ে। তবে কমরেড কখনো নিজের জন্য অন্যদের ডেস্ট্রয়েড হতে দেয় না। তাই ধরা পড়ার আগে সর্ব শক্তি দিয়ে কুলকুলি দেয়। যাতে অরিজিত, মালিনী, শামু, মন্টুরা সতর্ক হয়ে ডেরা বদল করে। এভাবেই বিপ্লবকে ডেস্ট্রয়েড হতে দেয় না দ্রৌপদী। এরপর সেনানায়কের আদেশে গ্রেপ্তার দ্রৌপদীর উপর অমানুষিক নির্যাতন ও ধর্ষণ চালায় পুলিশ বাহিনী। সারারাত ধরে অমানবিক যৌন নির্যাতন ও বারবার ধর্ষিত হওয়ার পরেও বিদ্রোহী চেতনায় ভাস্বর দ্রৌপদী বিন্দুমাত্র দমে না। উলঙ্গ

ধর্ষিত দ্রৌপদী আর বীভৎস হয়ে উঠে সেনানায়কের সামনে। বিবস্ত্র, নিরস্ত্র অবস্থায় দ্রৌপদী 'মর্দিত স্তনে সেনানায়ককে ঠেলতে থাকে এবং এই প্রথম সেনানায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়'[৯]। যে সেনানায়ক একদা বন্ধুকের 'মেল অর্গানে' সবার কাছে ক্ষমতা প্রদর্শন করতেন; তাঁর এই ভীতি শাসকদলের পরাভবের পরিচয় দেয়। একদা আই ভি রহমানকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মহাশ্বেতা বলেছিলেন—'দ্রৌপদী গল্প বিশেষ একটা আন্দোলনের কথা নিয়ে লিখেছি। ৭০-এর দশকে বিশেষ একটা জায়গায় আদিবাসীদের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। তাদের জায়গা জমি সব চলে যাচ্ছিল, সমস্ত জিনিসটাই একটা প্রতিবাদমূলক পটভূমি তৈরি করেছিল, দ্রৌপদী যখন উলঙ্গ হয়ে বেরিয়ে আসে তখন কিন্তু চরম একটা চপেটাঘাত সমাজের মুখেই পড়ে তাই না? গল্পের শেষে সেনানায়ক কিন্তু একেবারেই পরাজিত।

তারা শুধু একটা মেয়েকে উলঙ্গ করতে পারে—লালসা চরিতার্থ করতে পারে কিন্তু সম্মান দিতে পারে না। কিন্তু দেখো এই ঘটনার পর সমাজের মানুষ কিন্তু দ্রৌপদীকেই সম্মান করে তাই না? এই সম্মান দ্রৌপদী আদায় করে নিয়েছে। আমি চাই সমাজের দ্রৌপদীরা সবাই এইভাবেই জেগে উঠুক। কেড়ে নিক তাদের প্রাপ্য। পরাজিত হয়ে যাক ওই সব সেনানায়ক সব সমাজেই'[১০]।

পূর্বেই বলেছি তাঁর 'দ্রৌপদী' গল্পের প্রেক্ষাপট নকশালবাড়ির আন্দোলন। ১৯৬৭-তে নকশালবাড়ি থেকে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে থাকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। দ্রৌপদী ও ঝুলন ছিল এই আন্দোলনের যোদ্ধা। তাদের নামে পুলিশি ওয়ারেন্ট, কারণ তারা এলাকার দাপুটে জমিদার সূর্য সাহুর খুনের মামলার আসামী। এই গল্পে মহাশ্বেতা শুধুমাত্র গরিলা যোদ্ধার জীবন-যাপন ও রোমহর্ষক বীরত্বের কাহিনীতে আবদ্ধ না রেখে বিষয়বস্তুকে বৃহত্তর রূপ দান করেছেন। নকশাল আন্দোলনে নারী-পুরুষ উভয়েই শোষণের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল; তারা এই অত্যাচারী সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করেছিল। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে দ্রৌপদী মেঝেন ও তার স্বামী ঝুলন মেঝেনের লড়াই আর ব্যক্তিগত থাকেনি তা সাঁওতাল জনসমাজের অস্তিত্বের সংগ্রামে পর্যবসিত হয়। 'দ্রৌপদী' গল্পে আছে—

ক) সমাজের ভদ্র বাবু সম্প্রদায় বনাম নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর সংগ্রাম।

খ) দেশের সংবিধান অনুযায়ী সমাজের সর্বস্তরের মানুষের ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতিকে সমমর্যাদা দেওয়ার কথা। কিন্তু এখনো পর্যন্ত এই মানুষরা এই অধিকার থেকে বঞ্চিত।

গ) উচ্চবর্ণ সংস্কৃতির দাপটে এদের অবস্থান সঙ্কুচিত। আসলে শুধু কথাতেই 'ওয়ান নেশন ওয়ান ইন্ডিয়া' বাস্তবে তা দুরস্ত; আজও ওদের অবস্থার খুব একটা

বদল ঘটেনি। শুধু শোষকের রূপ বদলেছে, শোষণ অব্যাহত আছে।

তাঁর দ্রৌপদী বহন করেছে তিনটি পরিচয় নারী, সাঁওতাল এবং নকশাল। এই তিনটি পরিচয়েই তাকে দমিত হতে হয়। সাঁওতাল দমিত হয় উচ্চবর্ণের দ্বারা। নারী দমিত হয় পুরুষ দ্বারা। আর নকশাল দমিত হয় রাষ্ট্রের শাসকের দ্বারা। তাঁর 'দ্রৌপদী' গল্পে দেখতে পাই পুরুষরা গল্পের নায়িকাকে নগ্ন করেছে- ধর্ষণ করেছে। মহাশ্বেতা এই গল্পে শুধুমাত্র আদিবাসী নারীর নির্যাতনের চিত্রই তুলে ধরেননি, তার পাশাপাশি তুলে ধরেছেন সমাজের জাতিভেদ প্রথাকে। উলঙ্গ কালো আদিবাসী রমণী দ্রৌপদী কখন যেন সারা দুনিয়ার ব্ল্যাক ওমেনের প্রতিনিধি হয়ে রুখে দাঁড়ায় নারী-শক্তির প্রতীক হয়ে। 'দ্রৌপদী আরো কাছে আসে। কোমরে হাত রেখে দাঁড়ায়, হাসে ও বলে তুর সাঁধানের মানুষ। দোপ্দি মেঝেন। বানিয়ে আনতে বলেছিলি, তা কেমন বানিয়েছে দেখবি না?' ধর্ষিত হওয়ার পর দ্রৌপদী কাপড় পরতে অস্বীকার করে। কারণ সে মনে করে—'কাপড় কি হবে কাপড়? লেংটা করতে পারিস, কাপড় পরাবি কেমন করে? মরদ তু?...হেথা কেও পুরুষ নাই যে লাজ করব। কাপড় মোরে পরাতে দিব না। আর কি করবি? লেঃ কাঁউটারকর।'[১১] এভাবেই সে সেনানায়ককে অপমান করে। আসলে 'পুরুষের পৌরুষ তার ব্যক্তিত্বে, সমাজবোধে, দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে। সেনানায়ক এখানে মনুষ্যত্ববোধহীন মানুষের অধম এক জীব।'[১২] তাই তার মনে হয় না এখানে কোন মরদ আছে বলে। বানিয়ে নেবার প্রক্রিয়া বোঝাতে গিয়ে মহাশ্বেতা কাব্যিক ভাষা প্রয়োগ করেছেন। এতে নাটকীয় উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে—'অপেক্ষা করতে হয় না বেশিক্ষণ। আবার বানিয়ে নেবার প্রক্রিয়া শুরু হয়, চলতে থাকে। চাঁদ কিছু জ্যোৎস্না বমি করে ঘুমোতে যায়। থাকে শুধু অন্ধকার। একটি বাধ্য হয়ে পা ফাঁক করে চিতিয়ে থাকা নিশ্চল দেহ। তার ওপর সক্রিয় মাংসের পিস্টন ওঠে ও নামে, ওঠে ও নামে'[১৩]।

মহাশ্বেতার দ্রৌপদী, পুরাণের দ্রৌপদী থেকে আলাদা। সে সরাসরি প্রতিবাদ করে সমাজের অন্যায়কে উপড়ে ফেলার দুঃসাহস দেখায়। তার কার্যাবলী বৈপ্লবিক, সে খরার সময় উচ্চবর্ণের টিউবয়েল দখল করে, থানা আক্রমণ করে, বন্দুক ছিনতাই করে প্রমুখ কর্মকাণ্ডে শোষক সম্প্রদায়কে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে রাখে। তার নারী পরিচয়ের মধ্যেও পৌরুষ সত্ত্বার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। পুরাণের দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ থেকে রক্ষা করতে শ্রীকৃষ্ণ নেমে এসেছিলেন; কিন্তু মহাশ্বেতার দ্রৌপদী নিজেই নিজের রক্ষক। 'পুরুষ নারীর রক্ষক'—এই ধারনায় আঘাত করেন মহাশ্বেতা। লিঙ্গগত প্রতিরোধের চিত্রণ দ্রৌপদী। মহাভারতে সমস্ত পান্ডবদের সাথে দ্রৌপদীর বিবাহ; যেখানে নারীদেহ শোষণের রূপ চিত্রিত। সেখানে গল্পের দ্রৌপদীর শক্তি ও সাহস পুরুষতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ব্যাসদেবের মূল মহাভারত

থেকে অনেকটা অন্য পথে চলে এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের মহাভারত। বিভিন্ন জায়গায় দেবী দুর্গার কিংবা কালীর মতোই কিংবা তাঁদের অবতার হিসেবে দ্রৌপদী শক্তি দেবীর অবতার হিসেবে পরিচিত। মহাভারতে দ্রৌপদী কালো মেয়ে। কালো বলেই তার আর এক নাম কৃষ্ণা—'কৃষ্ণেত্যে বাব্রুবন কৃষ্ণাং কৃষ্ণাভূৎ সা হি বর্ণতঃ'। দ্রৌপদীর আবির্ভাব লগ্নে দৈববাণী শোনা গিয়েছিল- ক্ষত্রিয়কুলের ধ্বংসের জন্যই তাঁর জন্ম। সভামাঝে তাঁর অপমান কৌরব কুলের ধ্বংসের কারণ হয়। যে কারণে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 'কৃষ্ণা' কবিতায় বলেছিলেন—

'দন্তস্ফীত সে রাজশাসন/কটি হতে তব বসন টানে,—/হুতাশন হতে হুতাশন শিখা/গতাসু বিনা কে ছিনায়ে আনে?/পুরুষের মাঝে বিবস্ত্রা তুমি,/ধর্মমেযেরা শাস্ত্র ভাবে!/পুরুষ ছিল কি সেই সভাতলে/যারে দেখে তুমি লজ্জা পাবে?/শুধু বুঝে নিলে নরের রাজ্যে/কত নিরুপায় নিখিল নারী/প্রমোদ রাতে ও রাজার সভাতে/রহিল সমান প্রমাণ তারি।'[১৪] আবার মল্লিকা সেনগুপ্ত দ্রৌপদীকে নিয়ে লিখেছেন—'দ্রৌপদীর স্বামীরা', 'দ্রৌপদীর গান', 'দ্রৌপদী', 'দ্রৌপদীজন্ম' প্রভৃতি কবিতা। এখানে দ্রৌপদীর স্বামীদের প্রতি অভিযোগ ব্যক্ত হয়েছে। অর্জুনকে তিনি বলেছেন—

'তৃতীয় পার্থ তোমার জন্য
কলঙ্ক জলে ডুব দিলাম
পাঁচ ভাতারির বদনাম নিয়ে
রাজসভাঘরে রূপ নিলাম।'[১৫]

আবার অন্যত্র তিনি প্রশ্ন করেন-

'আমি একা হাটের মাঝে, হাটখোলা কাপড় খোলা
দোষ শুধু কৌরবেরই দোষী নয় পাণ্ডবেরা?
যে আমাকে পণ্য করে স্বঘোষিত প্রভু আমার
তাকে আজ প্রশ্ন করি মানুষের মূল্য কত!'[১৬]

আসলে সারা পৃথিবী জুড়ে রয়েছে নারীর প্রতি পুরুষতন্ত্রের শোষণ। ক্ষমতাশালীদের দ্বারা শোষিত হয় নারী। পুরুষের নারীদেহ ভোগ কামনাকে পরিতৃপ্তি দিতে দেহব্যবসার দ্বারা অর্থ উপার্জনে এগিয়ে আসে এক শ্রেণির লোভী মানুষেরা। সমাজে নারীকে দেবী করে তোলা ঐ সভ্য মানুষেরা সমাজের এই আড়ালে থাকা কদর্য দিকটিকে উপেক্ষিত অবলোকনে রেখে দেন। তাঁরা ভয় পান এই ভোগের উপকরণ পণ্য নারীকে চিহ্নিত করতে। মহাশ্বেতা তাঁর গল্পে এই দিকটি অনাবৃত করে দেন। তাই তাঁর গল্পে অনুভব করা যায় নারীদের যন্ত্রণার জ্বালাকে।

আবার মহাভারতের মতই গল্পের দলিত দ্রৌপদী পুরুষ শাসিত সমাজের

বশ্যতাকে মেনে নেয়নি প্রতিরোধ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'দ্রৌপদী' প্রবন্ধে আক্ষেপ করে বলেছিলেন—'সীতার সহস্র অনুকরণ হইয়াছে, কিন্তু দ্রৌপদীর অনুকরণ হইল না'। আসলে সমাজে সবাই সীতার মতো সহনশীল মেয়ে চায়, দ্রৌপদীর মতো প্রতিবাদিনী মেয়ে চায় না। কিন্তু 'সীতা সতী, পঞ্চপতিকা দ্রৌপদীকেও মহাভারতকার সতী বলিয়াই পরিচিত করিয়াছেন; কেন না, কবির অভিপ্রায় এই যে পতি এক হৌক পাঁচ হৌক, পতিমাত্র ভজনাই সতীত্ব। উভয়েই পত্নী ও রাজ্ঞীর কর্তব্যানুষ্ঠানে অক্ষুণ্ণমতি, ধর্মনিষ্ঠা এবং গুরুজনের বাধ্য।' সমালোচক, লেখিকা ও অনুবাদক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক ১৯৯৭ সালে 'ব্রেস্ট স্টোরিস' গল্পগুলিতে মহাশ্বেতার গল্পগুলিকে ইংরেজি অনুবাদ করেছেন। এতে একটি সংযোগকারী সূত্র আছে—স্তন প্রান্তিক সম্প্রদায়ের নারীদের শোষণের একটি রূপক। চারদিকে Identity Politics নিয়ে যে আন্দোলন জোরদার হচ্ছে তাতে এই অরণ্য সম্প্রদায়ের স্থান কোথায়? এ নিয়ে সংশয় তৈরি হয়। বর্তমানে মুক্তবাজার, কর্পোরেট সংস্থার সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, আর্থিক স্বনির্ভরতা সরকারি শিল্পের বেসরকারিকরণ, কৃষক শোষণ, দেশের রাজনীতিকরা রাষ্ট্রের গণতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করার খেলায় যে মেতে উঠেছিলেন তাতে দ্রৌপদী গল্পটি অন্য মাত্রা যোগ করে।

কলম্বিয়া, ইরাক, সুদান, নেপাল এবং আফগানিস্থানে ধর্ষণকে যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। দিল্লির মতো মেট্রোপলিটন শহর হোক বা অনুন্নত গ্রাম হোক সর্বত্রই নারীরা যৌন হয়রানির শিকার হয়। যুদ্ধের সবচেয়ে নৃশংস শিকারে ধর্ষিত হয় দ্রৌপদী, কারণ তাহলেই সে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে তথ্য দিতে বাধ্য হবে। আবার অনেক সময় মনে হতে পারে শুধুমাত্র বিদ্রোহীদের ধরিয়ে দিতে তথ্য প্রমাণ পাওয়ার জন্য এই ধর্ষণ নয়; আসলে দলিত মহিলাকে তার জায়গায় ফিরিয়ে আনার জন্য এই ধর্ষণ। কোন মহিলাকে সেনা ধর্ষণ করলে পূর্বে অনেক কাল অবধি তার বিচার হতো না। তখন এই বলে মীমাংসা হতো যে সেনা বহুকাল তার পরিবার ছেড়ে বাইরে থাকে তাই এই ঘটনা স্বাভাবিক। কিন্তু বর্তমানে আইন করে এই অবস্থার বদলি হয়েছে। যুদ্ধকালীন যৌন সহিংসতা বা যোদ্ধাদের দ্বারা সংঘটিত ধর্ষণ বা বলাৎকার মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের অংশ হিসেবে শত্রুকে অপমানিত করার উদ্দেশ্যে ধর্ষণকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এতে কোন গোষ্ঠীকে আংশিক বা সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করার জন্য ধর্ষণকে ব্যবহার করা হয়। ১৯৯০ সালে আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে ধর্ষকদের শাস্তিযোগ্য ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। 'দ্রৌপদী' গল্পের প্রেক্ষাপট হিসেবে মনে আসে একটি ঘটনার কথা; সম্ভবত মহাশ্বেতা এই ঘটনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। ১৯৭২ সালের ২রা মার্চ মহারাষ্ট্রের গদচিরোলি জেলার দোসাইগঞ্জ থানার চত্বরে মথুরা নামে এক অনাথ আদিবাসী

তরুণী মেয়েকে দুই পুলিশ সদস্য ধর্ষণ করে। পরিবারের সদস্যরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে অভিযুক্তদের নামে জজ আদালতে নালিশ করে। আদালতের রায়ে বলা হয় মথুরা যৌনমিলনে অভ্যস্ত হওয়ায় তার সম্মতিতে স্বেচ্ছায় যৌন মিলন হয়েছিল; সুতরাং শুধু যৌন মিলন প্রমানিত হতে পারে ধর্ষণ নয়। এরপর এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে বোম্বে হাইকোর্টে আপিল করা হয়; সেখানে বোম্বে হাইকোর্টের নাগপুর বেঞ্চ অভিযুক্তদেরকে এক এবং পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেয়। কিন্তু অভিযুক্তরা আবার ১৯৭৯ সালে সুপ্রিমকোর্টে আবেদন করলে সুপ্রিমকোর্ট অভিযুক্তদের বেকসুর খালাস করে দেয়। সুপ্রিমকোর্ট বলে মথুরা কোন শঙ্কা প্রকাশ করেনি; তার শরীরেও কোন আঘাতের চিহ্ন দৃশ্যমান নয়; তাই জোরপূর্বক ধর্ষণের ঘটনা ঘটেনি। এই রায়ের বিরুদ্ধে সেদিন অনেকেই প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, দিল্লি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক উপেন্দ্র বক্সী, রঘুনাথ কেল্কার, লতিকা সরকার প্রমুখরা। এই ঘটনার দ্বারাই পরবর্তীতে ২৫ শে ডিসেম্বর ১৯৮৩ সালে 'দ্যা ক্রিমিন্যাল ল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট' এর মাধ্যমে ভারতের ধর্ষণ আইন সংশোধিত হয়। তখন থেকেই পুলিশি হেফাজতে ধর্ষণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়। মহাশ্বেতা দেবীর 'দ্রৌপদী' গল্পটি তাই শুধু নারীত্বের অপমানের প্রতিবাদ নয়; নারীত্বের খোলস ছেড়ে মনুষ্যত্বের মহিমায় জঘন্যতম পাশবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্রতর প্রতিবাদ।

অশোক দাসগুপ্ত মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্য-প্রতিভা সম্পর্কে বলেছেন— 'রূপকথার জগত নির্মাণ করতে গিয়ে তিনি নতুন একটা স্বর, নতুন একটা ভাষাই তৈরি করে নিতে পেরেছিলেন। আর আশ্চর্য, সেই স্বর নাগরিক সমাজের সাহিত্যবোদ্ধা ও পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্যও হয়ে উঠল। সেই ভাষাকে মাটির ভাষা বলে গ্রহণ করতে কেউ দ্বিধা করল না। এককথায় বলা যায় মহাশ্বেতাদি ভারতীয় সাহিত্যে এক নতুন ভুবন তৈরি করলেন, যে ভুবনের কথা সেভাবে তাঁর আগে বাংলা সাহিত্যে আসেনি'[১৭]। প্রত্যক্ষভাবে আদিবাসী জনগণের সুখ-দুঃখে জড়িয়ে গিয়ে তাদের উন্নতিকল্পে নিজের জীবন সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেন মহাশ্বেতা। সমাজের এই বৈষম্যই তাঁকে প্রতিবাদী করে তোলে। তাই গল্পের বুননে প্রতিবাদী সত্তার এক বিশেষ রূপ প্রকাশ পায়। তিনি যেমন আদিবাসী উন্নয়ন কাজে যুক্ত হয়েছেন তেমনি তাদের বঞ্চিত জীবনের কথা সমস্যার স্বরূপ শিক্ষিত মানুষের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন; হয়ে উঠেছেন activist writer।

তথ্যসূত্র :

১. কিন্নর রায়। তিনি আমাদের শিখিয়েছিলেন সাহসী হতে। তবু একলব্য। মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যা। পৃ-৩৩

২. কিন্নর রায়। তিনি আমাদের শিখিয়েছিলেন সাহসী হতে। তবু একলব্য। মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যা। পৃ-৪২।

৩. কিন্নর রায়। তিনি আমাদের শিখিয়েছিলেন সাহসী হতে। পৃ-৪২।

৪. মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র। অষ্টম খণ্ড। অরণ্যের অধিকার' (১৯৭৭)। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। এপ্রিল ২০০৩। পৃ-৯০।

৫. মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র। নবম মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র। অষ্টম খণ্ড।। চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর-১৯৮০। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। এপ্রিল ২০০৩। পৃ-১৩০।

৬. মহাশ্বেতা দেবী। মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র। অষ্টম খণ্ড। ভূমিকা। অগ্নিগর্ভ। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। এপ্রিল ২০০৩। পৃ-২৩৫।

৭. সেলিব্রেটিং উইমেন : এ সিম্পোজিয়াম অন উইমেন হু মেড অ্যা ডিফারেন্স। স্পিকার -গণেশ এন দেবী। ২০০৪।

৮. মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সংকলন। (লেখিকা কর্তৃক নির্বাচিত)। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট , ইন্ডিয়া। নয়াদিল্লি। ১৯৯৩। নবম পুনর্মুদ্রণ ২০১৫। পৃষ্ঠা- ২৯।

৯. তদেব। পৃষ্ঠা-৩৯।

১০. রহমান আই ভি। মহাশ্বেতা দেবীর সাথে এক সন্ধ্যা। এই দেশ পত্রিকা। ঢাকা। ৫ই ফেব্রুয়ারি, বুধবার, ২০১৪।

১১. মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সংকলন। (লেখিকা কর্তৃক নির্বাচিত)। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট , ইন্ডিয়া। নয়াদিল্লি। ১৯৯৩। নবম পুনর্মুদ্রণ ২০১৫। পৃষ্ঠা-৩৯।

১২. (বিনীতা রাণি দাস। মহাশ্বেতার গল্পে নারীরা। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। কলকাতা। নববর্ষ ১৪২৪। পৃ-৯৫)

১৩. তদেব। পৃষ্ঠা-৩৮।

১৪. যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা। সুশান্ত বসু। ভারবি। কলকাতা। সেপ্টেম্বর ২০০১। পৃষ্ঠা- ৮৬,৮৭।

১৫. সুবোধ সরকার(সম্পাদক) মল্লিকা সেনগুপ্ত, পদ্যসমগ্র, প্রথম সংস্করণ, মার্চ ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা পৃ-২০৮।

১৬. তদেব। পৃ-৩১৬।

১৭. বাহারুদ্দিন (সম্পা), আরম্ভ সীমান্তহীন মাসিক, বর্ষ ৮, সংখ্যা ৫, আগস্ট ২০১৬, পৃষ্ঠা -৩৫।